শাসক

বাণী দত্ত

এটা শহরের পুরাতন অংশ। পুরাতন অংশ না বলে আদিশহর বলাই উচিৎ। কারণ আদ্যভাগের অনেক অংশেই এখন নূতনের উচ্ছ্বাস। তবুও এই অঞ্চলেমনুষ্য বসবাসের প্রাচীনতম ইতিহাস এখানেই পাওয়া যায় বলেই শহরেরনামের আগে 'পুরাতন' কথাটি ব্যবহার করা হয় অত্যন্তবহুলভাবে। মোটামুটি সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা। ধূলোর আধিক্যনাই, অনেকটাই মালিন্যহীন। দুপাশে সারিসারি শালগাছ। কদাচিৎ পিয়াল,ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া ও আম্রখ। দিনের বেলায় এ পথ দিয়ে গাড়িতেবা মোটর সাইকেলে অনেকবার এসেছে তীর্থ। আজ রাত্রে হাসপাতালে ফিরছেহেঁটে। চন্দ্রালোকিত রাত্রি। কাল পূর্ণিমা বোধ হয়। শালগাছের ফাঁকদিয়ে ভরা যৌবনা পূর্ণিমার লাস্য। রাত্রি দশটা বিগত হয়েছে। চারিদিক শুনশান।নিস্তব্ধ জনহীন যানহীন রাস্তায় একাকী মানব। বেশ ভালোই লাগছে।যেন এই বিশাল পৃথিবীতে সে একাই জীবন্ত। ওরা অবশ্য বলেছিলো "ডাক্তারবাবু, একটা লোকাল রিক্সা ডেকে দিচ্ছি, নয়তো স্কুটারে পৌঁছেদিই।" তীর্থ আপত্তি করেছে। তার ইচ্ছা করছিলোরাস্তাটা হেঁটেই যেতে; হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে।কিন্তু সে কথা তো তাদেরকে বলা যাবে না। তাই সে হেসে উত্তর দিয়েছিলো, "একটু হাঁটি । নিজে না হাঁটলে পেশেন্টদের উপদেশ দেব কী করে ? আমি চলি। যে ভাবে বলেছি, ছেলের যত্ন নেবেন।"

যত্ন তাঁরা যথেষ্টই নেবেন। এই ছেলের মুখচেয়েইতো বৃদ্ধ বাবা মা দিনাতিপাত করছেন। ভালো রোজগার করে।উড়িষ্যার বারিপদায় থাকে। সপ্তাহান্তে বাড়ি আসে। এই অঞ্চল থেকেউড়িষ্যা বা বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুলোক কাজকর্ম করে। শিকড়ের টানে কেউ সপ্তাহান্তেকেউবা পক্ষান্তে বাড়ি আসে। বৃদ্ধ দ্রকান্ত বটব্যাল এখানকারকুমুদকুমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বয়স সত্তর পেরিয়েছে। পেনশন পানসামান্য। তবে নিয়মানুযায়ী অন্যান্য অনেকের মতোই সময়ে পান না।শিক্ষক জীবনে আদর্শ ও শিক্ষাদানই ছিল ধ্যানজ্ঞান। তাই অবসরজীবনের অভাব আর বঞ্চনা তাঁকে আহত করে; তবে অবাক করে না। তাঁরসমাজকে তিনি চেনেন। এই ছেলেই বাবা মায়ের দেখাশুনা করে। ওরই বিয়ের বয়সপেরিয়ে যাচ্ছে। রুদ্রকান্ত তাগিদ দেন। ছেলে রাজি হয় নি। আর এই মূহুর্তে তো সেব্যাপারটা ভাবার প্রশ্নই নাই। বৃদ্ধা বলছিলেন, "ডাক্তারবাবু, আমাদের দু'জনেরই বয়স হয়েছে। আমরা আর ক'দিন ? শুধু আপনার দয়ায় এই বয়সে আর পুত্রশোকপেতে হোল না।"

তীর্থ উত্তর দিয়েছিলো, " কী যে বলেন ! ওর আয়ু ছিল, তাইভালো হয়েছে। রোগটা জটিল ছিলো, সন্দেহ নাই। ঠাকুরের দয়া ছিলো। আমরাসময়ে সব কিছু করতে পেরেছি।"

দ্রকান্ত বললেন, "ডাক্তারবাবু , আপনিবয়সে ছোট, মনে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই বুড়ো মানুষ বলে দুএকটা কথাবলবো। এটা ঠিক যে মানুষের ললাট লিখন জন্মলগ্নেই স্থির হয়েআছে। এই ছোট ছেলেটাই আমাদের অবলম্বন। ও না থাকলে আমাদের বাকি জীবনটাকাকে নিয়ে থাকতাম ? আপনি যা করেছেন বিজুর জন্য , যেটা আপনি অনেকবার বলেছেন আপনিকর্তব্য করেছেন। আমরা তো বুঝি আপনি কর্তব্যকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যা এখানে করা যায় না,তাও করেছেন। ভগবান আপনার মঙ্গল কন।"

কথাটা মনে পড়ায় তীর্থ আপনমনেই মুচকি হাসলো। ভগবান সত্যই মঙ্গলময়। মঙ্গলময়বলেই এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শুভেচ্ছা জুটলো। আবার ভগবান মঙ্গলময় বলেই বোধহয়স্ত্রী-কন্যা-পুত্র ছেড়ে সে চাক্‌রি বজায়রাখতে এসেছে সীমান্তবর্তী এই হাসপাতালে। ডাক্তার হওয়ার সুবাদে এক বৃদ্ধদম্পতির অবলম্বনকে আবার ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন ভগবানের দয়াতেই। কিন্তুতার নিজের সন্তানেরা যখন অসুস্থ হয়, তখন তার উৎকণ্ঠা কে নিরসনকরবে? ভাগ্যিস তার ডাক্তার বন্ধু মৃগেন কাছেই থাকে। সময়ে অসময়ে সেইপ্রাণপনে দেখাশুনো করে। কিন্তু অসুস্থ সন্তান যখন বাবার সান্নিধ্যচায়, তখন তো সে তা দিতে পারে না। এই ব্যাপারটাই তাকে উস্‌কেদিয়েছিলো বিজিতকে ভালো করার জন্য। ছেলেটি তার আণ্ডারে ভর্তি হয়েছিলোমাসখানেক আগে। বারিপদায় অসুস্থ হয়। জ্বর আর গলা ব্যাথা দিয়ে আরম্ভ।তারপর বিভিন্ন জায়গায় গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। বেগতিক দেখে বিজিতকেবারিপদার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালটির নাম আছে। অসুস্থঅবস্থায় বিজিত চিঠি লেখে বাবা মাকে। জানায় যে হাসপাতাল থেকে ছুটিপেলেই সে বাড়ি আসবে। তাঁরা যেন না ভাবেন। ছেলে তো চিঠি লিখেই খালাস।বাবা মায়ের উৎকণ্ঠার কথা তার বোঝার কথা নয়। বেশি বয়সের সন্তান।দ্রকান্ত ও তাঁর স্ত্রী কণা চরম মানসিক অশান্তিতে দিনাতিপাত করতেলাগলেন। সেই উদ্বেগ তুঙ্গে উঠলো যখন একদিন বিজিতের এক বন্ধু একা এসে হাজির হোল। সেজানালো যে বিজিতের অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তাররা সন্দেহ করছেনলিউকিমিয়া হতে পারে। খবরটা শুনেই দ্রকান্ত ও কণা বিহ্বল হয়েগেলেন। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের এ হেনঅসুখের কথা শুনে কোন বাবা মা-ই বা ঠিক থাকতে পারেন ? যাই হোক তাঁরাতড়িঘড়ি বারিপদায় পৌঁছে হাসপাতালে চলে গেলেন। ডাক্তারদের

সঙ্গে কথা বলেজানতে পারলেন তাঁরা রক্তের ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া বলেই সন্দেহ করছেনরোগটিকে ।এবং তার থেকেই ব্রেন অ
াক্রান্ত হয়েছে। রোগির অবস্থাভালো নয়। তাঁদের পরামর্শ হোল কটক কিংবা ভুবনেশ্বরে মেডিক্যাল কলেজেভর্তি করে রোগটি সঠিক
কিনা তা' দেখা । ছেলেকে দেখে কণা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।বিজিত একেবারে অস্থি সর্বস্ব হয়ে গেছে। আচ্ছন্ন অবস্থা। ড
াকলেঅস্পষ্টভাবে অল্প সাড়া দেয়। মাঝে মাঝে বমি হচ্ছে। কটকে বাভুবনেশ্বরে নিয়ে গেলে বিদেশ বিভুঁয়ে কী হবে তার ঠিক নাই। ত
াঁরা মনস্থ করলেনও কে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়াই শ্রেয় । সেখান যা হ'বার তা-ই হবে।
একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডেকে উঠলো । এই চন্দ্রালোকিতরাত্রে , এই সুস্তব্ধ বাতাবরণে পেচক পুঙ্গবের হয়তো পুলক
জেগেছে।পুলক আর দুঃখ নিয়েই তো প্রানিজগৎ। মানুষের ক্ষণস্থায়ীজীবনও বড়োই দোলায়মান। একই ক্ষণে কেউ পুলকিত ,কেউ
শোকাকুল। যেমন বিজিতকেপ্রথম এগ্জামিন করার দিনটা ছিলো চরম উৎকণ্ঠা আর অজানাআশঙ্কায় ভরা। সেদিনটা আজও
তীর্থর মনে আছে । মেলওয়ার্ডে রাউন্ড দিয়েএসে প্রেসক্রিপশন লেখার সময় একসৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ও সঙ্গের বৃদ্ধা নমস্কার করে দাঁড়
ালেন।
" বলুন ।" -তীর্থর পেশাগতজিজ্ঞাসা।
" ডাক্তার বাবু , আমার নাম দ্রকান্তবটব্যাল। দশনম্বর রোগিটিকে কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু ?"
" এইমুহূর্তে খারাপ। মেনিন্জাইটিস হয়েছে। বারিপদার কাগজপত্র দেখলাম । ওদেরডায়াগ্নোসিস অনুযায়ীমেনিন্জাইটিসের ক
ারণ লিউকিমিয়া । অর্থাৎ বারিপদার ডায়াগ্নোসিস্ মেনেনিলে রোগটি দাঁড়ায় লিউকিমিক্ মেনিন্জাইটিস্।
" আপনি ও কী তাই মনে করেন ?"
" দেখুন, আমি চার বছর হেমাটোলজিতেকাটিয়েছি। আমার থিসিস্ও হেমাটোলজিতে। সেখানে তো এসব রোগই ঘাঁটতে হোত।
কেস্টাকম্প্লিকেটেড সন্দেহ নেই। তবে ঠিক লিউকিমিয়া বলে মনে হচ্ছে না।
আপনারা ছেলেটির কে হন?"
"মা ও বাবা, " বৃদ্ধা বললেন, " ও আমাদের বেশি বয়সের সন্তান। "
" ওর ব্লাড টেস্টের স্লাইড্গুলো আছে ? আমরাওব্লাডটেস্ট করবো। তবে পুরনো স্লাইড গুলো থাকলে ভালোহয়"।
"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু " বৃদ্ধ বললেন, " বারিপদা থেকে স্লাইডগুলো আমাকে দিয়েছে।"
" এখন আপনারা ঠিক কন রোগি এখানে রাখবেননা কোলকাতা নিয়ে যাবেন।"
বৃদ্ধা জলভরা চোখে উত্তর দিলেন, "ডাক্তারবাবু, আমি ওকে পেটে ধরেছি। আর একটা ছেলে আমার আছে। তার কথাথাক। কে
লকাতা গেলে সব ব্যবস্থাই করা যাবে। কিন্তু কোলকাতা আমরাযাবো না । আমি মা। হারালে আমারই হারাবে। আমি বলছি ওর
যা হয় হোক ।আপনি এখানে যা সম্ভব তাই কন। "
পৃথিবীতে শুধু মায়েরাই একথা বলতে পারে।
তীর্থ মুগ্ধ হয়ে গেলো। এবং সব দ্বিধা কাটিয়ে তখনইস্লাইডগুলো নিয়ে লেবরেটরিতে গেলো। মাইক্রোস্কোপে অনেকক্ষণ
ধরেখুঁটিয়েখুঁটিয়ে দেখলো স্লাইডগুলো । নিঃসন্দেহ হোল যে লিউকিমিয়া নয়। এটা আরএকটা রোগ । ইন্ফেক্শাস মনো
নিউক্লিওসিস্। দেখা অভ্যাস না থাকলে এ রোগ ধরা মুস্কিল।
রোগির বাবা মা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গেদেখা হয়ে গেলো।
" কেমন দেখলেন ডাক্তার সেন? বারিপদায় যাবলেছে তাই ? ব্লাড ক্যান্সার ?"
তীর্থ মৃদু হাসলো । একটু আশ্বাসের সুরে বললো।" আমার তা মনে হচ্ছে না। কাল এখানে আমরা ব্লাড টেস্টকরবো। আর একটা
বোন্ ম্যারো এগ্জামিন করতে হবে। অর্থাৎ হাড় ফুটোকরে অস্থিমজ্জা নেওয়া হবে। এই হাসপাতালে ওই যন্ত্র নেই । আপনারা অ
াজওযুধের দোকানে অর্ডার দিন। ওরা কালই এনে দেবে কোলকাতা থেকে।"
ভদ্রমহিলা ছলছল চোখে বললেন , " ডাক্তারবাবু,আপনার কথাই যেন ঠিক হয়। আপনি যে যন্ত্রের কথা বলছেন হাসপাতালে
নেই,আমরা কালই আনিয়ে দেবো। বাবা, ভবিষ্যৎ কেউ খন্ডাতে পারে না। তবু বেঁচে থাকতেপেটের সন্তান কে হারাবো, একথা ভ
াবতেই শিউরে উঠছি।"
আজ এই জ্যোৎস্নালোকে, এই ধ্যানমগ্ন রাত্রিতে ,দুপাশের ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে যেতেযেতে তীর্থর স্পষ্ট মনে পড়ে
সেই আর্তির কথা, সে ব্যাকুলতার কথা, যাশুধু মাতৃহৃদয় থেকেই উৎসারিত হতে পারে। মনে পড়ে সেই মুহূতেই তীর্থমনস্থির
করেছিলো , কেস্টা নিয়ে লড়ে যেতে হবে। একটা মফঃস্বলহাসপাতালে যেখানে প্রতিদিন অনর্গল কেস ভর্তি হয়, সেখানে সব কেস্
নিয়েলড়া যায় না। তবু দু'একটা ব্যতিক্রমী কেস মাঝে মাঝে থাকে যাদের জন্যএকটু বেশি উদ্যম প্রয়োজন হয়। এম ডি করার সময়
বছর চারেকহেমাটোলজিই ছিলো তার ধ্যান জ্ঞান। ইচ্ছা ছিলো সে হেমাটোলজিস্টঅর্থাৎ রক্তের বিভিন্ন রোগের স্পেশালিস্ট হবে।
কিন্তু এ দেশের স্বাভাবিকনিয়ম অনুযায়ী হয়ে গেলো নিউরোলজিস্ট। একটা কঠিন কেস্ নিয়ে লড়ার জন্য ডাক্তরকেও মানসিক

প্রস্তুতি নিতে হয়। তীর্থ নিজেস্থিরচিত্ত হোল যে রোগটালিউকিমিয়া নয়।
পরদিন আবার রক্ত পরীক্ষা হোল। প্যাথোলজিস্ট ডাঃ নন্দী দেখলেন। ব্লাডসেলগুলো স্বাভাবিক নয় একথা তিনি মানলেন, আবার ঠিক লিউকিমিয়া সেল ওনয়। তীর্থও স্লাইড দেখলো এবং নিঃসন্দেহ হোল যে লিউকিমিয়া নয়, -ইন্‌ফেক্‌শাস্‌ মনোনিউক্লিওসিস্‌। লিউকিমিয়ার সঙ্গে যেটার গুলিয়েযাবার সম্ভাবনা আছে। তার কথা শুনে ডাঃ নন্দী আবার স্লাইডটাকে খুঁটিয়ে দেখে তার মতেইমত দিলেন।
চিকিৎসা আগের দিনেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। আজ সামান্য রদবদল হোল। সেদিন সন্ধ্যায় এলো বোনম্যারোপরীক্ষার যন্ত্র । তীর্থ সিস্টারদের বোন ম্যারো পরীক্ষার সেটতৈরী রাখতে বললো। পরদিন সকালে বুকের হাড় ফুটো করে টেনে নিলোঅস্থিমজ্জা। এবং এ পরীক্ষাতেও লিউকিমিয়া অপ্রমাণিত হোল। দুপুরেলাম্বার পাংচার করে শিরদাঁড়া ভেদ করে জল বের করা হোলমেনিনজ াইটিসের কারণ জানার জন্য। সন্ধ্যা নাগাদ তার রিপোর্ট পাওয়া গেলোডাঃ হালদারের লেবরেটরি থেকে। সেই সন্ধ্যায় রোগির ব াবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিনিয়ে দাঁড়ালেন।
"ডাক্তারবাবু , ও কেমন আছে ?"
" রক্ত পরীক্ষা করে আমার তোলিউকিমিয়া বলে একবারও মনে হয় নি। বোন ম্যারো এবং লাম্বার পাংচার করেওখারাপ কিছু ধরা পরে নি। রোগটা আমাদের মনে হচ্ছে ইন্‌ফেক্‌শাসমনোনিউক্লিওসিস। এটা একটা ভাইরাসঘটিত রোগ। এবং ওরমেনিন্‌জাইটিসট াও সেই কারণে। কতটা কী ফিরবে বলতে পারছি না। তবে প্রাণের ভয়অনেকটাই কমে গেলো এটুকু বলতে পারি "।
বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, "ডাক্তার বাবু , এই অশ্বাসটুকুই যথেষ্ট। আমাদের আর কোনপরীক্ষা করতে হবে কি?"
"ইউরিন আর রক্তের কয়েকটা স্পেশালটেস্ট করতে হবে। এগুলোকোলকাতায় করতে হবে। কোলকাতার একটা সেন্টার থেকে লোক এসে এখান থেকেই রক্ত,প্রস্রাব নিয়ে যায়। তবে সেটার উপর চিকিৎসা শুটা নির্ভর করছেনা।"
তারপর ক'দিন চললো প্রাণপণ লড়াই।হাসপাতালের সিস্টাররাও খুব উৎসুক ছিলেন। মফঃস্বলের একটাহাসপাতালে এই রোগ ড ায়াগনোসিস করে তার চিকিৎসা করা কঠিনব্যাপার। সকলের চেষ্টায় দশদিন বাদে বিজিতের জ্ঞান ফিরলো।
আজ এই উদ্ভাসিত যামিনীতে তীর্থ সেদিনের তার নিজেরআবেগটি আর একবার অনুভব করলো। প্রকৃতির নিয়মে দিন রাত্রি হয়,সূর্যোদয় চন্দ্রোদয় হয়। কিন্তু ব্যাধি প্রায়শঃই কোন নিয়ম নামেনেই চলে আসে । প্রাণিদেহই হচ্ছে ব্যাধির অবলম্বন। তাই অবলম্ বন ত্যাগকরে সে সহজে যেতেও চায় না। বিজিতের বেলায়ও তাই হয়েছিলো। হাসপাতালেরঅন্যান্য ডাক্তাররা বলেছিলেন যে এরকম জটিল কেস এখানে, এই মফঃস্বলে না রাখাইভালো। কিছু একটা হলে বহু কথা উঠবে। কোলকাতার কোন সাধারণ সরকা রিহাসপাতালে গিয়ে মফঃস্বলের কোন রোগির অবস্থা অপেক্ষাকৃত কমডিগ্রিধারী চিকিৎসকের হাতে খারাপ হলে তাতে দোষ নাই। কিন্তু মফঃস্বলেরকোন হাসপাতালে বেশি কোয়ালিফিকেশনের ডাক্তাররা প্রাণপাত করলেওরোগি খারাপ হলে প্রায়ই ডাক্তারদের দা য়ি করা হয়। তীর্থ এসব বোঝে, কিন্তু মানেনা যে মফঃস্বলে কঠিনরোগের চিকিৎসা সে করতে পারবেনা। তাইপ্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে ম ানসিক ও শারীরিক সমস্ত শক্তি দিয়ে সে বিজিতের চিকিৎসা করেছিলো।তাই বিজিত যে দিন চোখ মেললো, সেদিনতার আনন্দের সীমা ছিলনা। ডাক্তারেরজীবনে এটাই বড়ো পাওনা।
ছেলেকে দেখে দ্রকান্ত আনন্দাশ্রু নিয়ে কাছে এসেদাঁড়ালেন। "আপনার লড়াই এর সাক্ষী হয়ে রইলাম ডাঃ সেন।আমার স্ত্রী কণার সঙ্গে কথা বলছিলাম। এখানে যদি বিজুকে ভালো করা না যায়, তাহলে আর কোন জায়গাতেই ভালো করা যাবে না।"
"ওর জ্ঞান ফিরেছে বটে, তবে এখনো বিপদ্মুক্ত নয় ", তীর্থেরসাবধানী জবাব।
" না ডাক্তারবাবু " , কণাএতক্ষণে এসে গেছেন," মায়ের মন বলছে ও এবার পুরোপুরি ভালো হয়েযাবে।"
"ব্যাপার কী জানেন? জটিল রোগ চিকিৎসা করতে আমিভালোই বাসি। আমার ট্রেনিং ও আছে। কিন্তু আমি একা একা অ ারকতজনের জন্যে লড়বো? আর এই দীনহীন পরিকাঠামোতে এই রোগের চিকিৎসাকরা খুবই কঠিন। সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম আপনারা ওকে কোলকাতায়নিয়ে যান।"
"ডাক্তারবাবু , " দ্রকান্তবললেন, " কোলকাতায় নিয়ে গেলে আমরা বড়ো হাসপাতালে ভর্তি করতেপারতাম। কিন্তু যে মমতায় অ াপনি চিকিৎসা করেছেন, সেটা কী কোলকাতায় পেতাম?"
"কোলকাতায়আপনাদের কেউ আছে বুঝি ?"
" হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আছে। যদিও তার সঙ্গেকোন যোগাযোগ নেই" —দ্রকান্তের কণ্ঠে ক্ষোভ, "আমাদেরবড়ো ছেলে আছে। সে ও ডাক্তার ।তবে হাসপাতালে কাজ করে না । কাজ করে রাইটার্সে। আপনাদের কোনএকটা ডিপার্টমেন্টের এ ডি এচ এস।
তীর্থ সচকিতহয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কী নাম তাঁর?"
" অজিত, ডাক্তার অজিত বটব্যাল।"
তীর্থ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ডানদিকে শালবীথি গেস্ট হাউস পেরিয়ে এলো তীর্থ। শহরের কলুষতা থেকেদূরে ছিমছাম এই গেস্ট হাউসটি শুক্লা চতুর্দশীর অন াগত মধ্যযামে এক অপূর্ব সুষুপ্তপুরীর রূপ ধারণ করেছে। লনেরআলোটি শাল সেগুন মেহগিনি গাছের উপর পড়ে এক মায়াবী প্রচ্ছদতৈরী করেছে। অধরা প্রকৃতি আপন খেয়ালে মাঝে মাঝেই হয়ে ওঠেরূপবতী , মাঝে মাঝেই করে ফেলে রূপসংহার। প্রকৃতির এইদ্বৈতরূপে অন্বিত হয়ে মানুষও কখনো হয় চঞ্চল, কখনো স্তম্ভিত। তীর্থ ও সেদিন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিলো! অজিত বটব্যাল! তার জীবনের অন্যতম শনি। এ কার পরিবারেরচিকিৎসা করছে সে ? তার সমস্ত হৃদয় তিক্ততায় ভরে গেলো। ওই একটিলোকের জন্য ত ার অনেক কিছুই তছনছ হয়ে গেছে। তীর্থর মনে পড়ে বদ্ধ তারপরে যেন স্বগতোক্তি করেছিলেন।

" বহু ত্যাগ স্বীকার করে তাকে ডাক্তারিপড়িয়েছিলাম। ডাক্তার হয়ে আমাদের অমতে বিয়ে করলো। এখন দেখা ও করে না।কোলক াতাতেই থাকে। বৌমা ধনী লোকের মেয়ে। ছেলেরও না কি রোজগারপ্রচুর।"

আজ ও তীর্থ এক বিন্দুও ভোলেনি একানব্বই সালের শেষআর বিরানব্বই এর প্রথমের সেই মাস দুই আড়াই-এর ঘটনাগুলো। এমডি পাশ করেছিলো সেই ঊনআশি সালে। তখন থেকেই চেষ্টা করেছিলো কোনএকটা সাবজেক্টে সুপারস্পেশালাইজেশন অর্থাৎ ডি-এম করার জন্য।কোলকাতায় তখন দুটো সাবজেক্টে ডি-এম করা যায়। কার্ডিওলজি ওনিউরোলজি। নিউরোলজিস্ট হবার বাসন া নিয়ে আর জি কর মেডিক্যালকলেজে এলো অষ্টআশি সালের জুন মাসে। দু'মাস বাদেই হঠাৎ একদিন তাকে পাঠানো হোল বেহ ালারহাসপাতালে ভেজাল তেলে আক্রান্ত রোগিদের চিকিৎসার জন্য, মানুষেরজীবন নিয়ে যে নিয়ন্ত্রা অবিরত কলকাঠি নেড়ে চলেছেন। তাঁরই কিছুপ্রতিভূ বোধহয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ শালায় বসে নিরন্তর আরওসূক্ষ্মএক্সপেরিমেন্ট করতে ব্যস্ত। না হলে মাঝখ ানে এতগুলোমেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট থাকতে প্রত্যন্ত উত্তর কোলকাতাথেকে অতিদূর বেহালায় তাকে পাঠানো হোল কেন, বহুদিন সেটা তার কাছে ছিল একঅপার রহস্য। পরে বুঝেছে এও এক লবি-রাজ।

নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোয়ার্টার পায়নি বলে ঘরভাড়া করে থাকতো দমদমে। সুদূর উত্তর কোলকাতা থেকে প্রতিদিনআসতো বহুদূর দক্ষিণে। ঠিক সকাল সাতটায় বেরিয়ে ঘরে ফিরতোবিকাল পাঁচটায়। উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রতীক্ষায় থাকতো সদ্যসিজার হওয়া স্ত্রী, চ ারবছরের কন্যা ও তিনমাসের পুত্র। বেহালায় থাকাকালীনএকানব্বই সালে ডি-এম নিউরোলজিতে সুযোগ পেলো। এর জন্য পি- জি হাসপাতালেপোস্টিং অর্ডার হোল। কিন্তু ছাড়া পায়না বেহালা হাসপাতাল থেকে।হাসপাতালের সুপার বললেন যে বিষতেল খেয়ে পঙ্গু ব্যক্তিদের ব্যাপারটা খুবইস্পর্শকাতর, রাইটার্স অর্ডার না দিলে তো ডাঃ সেনকে তিনি ছাড়তে পারেননা। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে দিনগুলি পেরিয়ে যায়। তীর্থ অতি কষ্টেবেহালার ডি উটি এবং পিজি হাসপাতালের পড়াশুনো চালাতে লাগলো।শ ারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনভিপ্রেত আত্মনির্যাতনের পর্যায়ে চলে এলো।বেহালা হাসপাতালের সুপারকে প্রায়ই অনুরোধ করে ছেড়ে দেবার জন্য।কারণ বেহালা থেকে ছাড়া পেলে আর -জি-করে জয়েন করতে হবে, আর-জি-করছাড়লে পিজি হাসপাতালে জয়েন করতে হবে। শিক্ষার পথ অতীবকক্ষরময় ও সংকটময়। শেষকালে একদিন তীর্থই বেহালার সুপারকেপ্রস্তাব দিলো, " আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমিই না হয়সপ্তাহে একদিন এসে বেহালার রোগিদের দেখে যাবো"।

সুপার বললেন,"খুব ভালো হয় তা হলে। আপনিই তিনবছর ধরে ওদেরকেদেখছেন। আপনি সপ্তাহে একদিন দেখলেই যথেষ্ট। অ াপনি কাইন্ড্‌লি আপনারপ্রফেসারের কাছ থেকে যদি লিখিয়ে নিয়ে আসেন।"

পরদিন পিজিতে তার প্রফেসরকে গিয়ে বললোতার সমস্যার কথা। তিনি রাজি হলেন এবং লিখে দিলেন যে তীর্থকে সপ্তাহে একদিনকয়েকঘন্টার জন্য ছাড়তে তাঁর আপত্তি নাই। বেহালা হাসপাতালের সুপারসেই মর্মে রাইটার্সে লিখলেন। তখন একানব্বই সালের সেপ্টেম্বর মাস।ভর্তি হওয়ার পর নয়টি মাস গত হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে কুমুদকুমারীস্কুলের কাছাকাছি চলে এসেছে তীর্থ। এখানকার অন্যতম ভালো স্কুল। বহু ভালোছাত্র বেরিয়েছে এই স্কুল থেকে । অনেকেই তারা প্রতিষ্ঠিত। এই সববহুস্কুল থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে অনেক ছেলে ডাক্তারিও পড়ে। মনেতাদের অনেক স্বপ্নও থাকে । সবস্বপ্ন ভেঙে যায় যখন ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ারসময় তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় সমাজের শত্রু হিসাবে। দ্রকান্তও এইস্কুলে মাস্টারি করেছেন। তাঁর দুই ছেলে অজিত ও বিজিত এই স্কুলেইপড়াশুনো করেছে। দিনের বেলা এই বিশাল প্রাঙ্গন ছাত্রদের কলরবে গম্‌গম্‌করে। এখন এই নিশালোকে নিশ্চল বিশ্রামরত ইমারৎগুলি পরদিনের কলরবেরজন্য প্রতীক্ষমান। জগতে সমস্ত প্রাপ্যের জন্যইপ্রতীক্ষার প্রয়োজন আছে। তীর্থও প্রতীক্ষ াকরেছিলো। সুপার ফোন করেন, রাইটার্সে যান। দুমাস কেটে গেলো।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুপারিনটেনডেন্ট একদিনবললেন," ডাঃ সেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ নাগ বলেছেন যে আপনারফাইলটা মুভ্‌ করছে। উনি চান আপনি একবার রাইটার্সে গিয়ে ওনার সঙ্গেদেখা কন।"

এই একটা কথা শুনলেই তীর্থর সমস্ত শরীরকুঁকড়ে যায়, অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। রাইটার্স বিল্ডিং যাওয়াটাতার কাছে এক চরম বিভীষিকা। কেউকেটা না হলে রাইটার্সে যাওয়ামানেই বিড়ম্বনা, হেনস্থা, অপমানিত হওয়া ও হতাশা। সে বলেছিলো,"রাইটার্সে না গেলেই হয় না ? আপনি তো গেছিলেন"। সুপার বলেছিলো, "একবার যান না। উনি বলেছেন একবার গেলেই হবে। তাছাড় াজয়েন্ট সেক্রেটারী হয়ত ভাবী নিউরোলজিস্টকে দেখতেচান।"

অগত্যা! অগত্যাঅনিচ্ছা সত্ত্বেও একানববই এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একবার রাইটার্সে গেল তীর্থ। আইডেন্টিটি কার্ড নেই। নীচে পুলিশের কাছে স্লিপ ইস্যুকরিয়ে উপরে গিয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ নাগের সাথে দেখা করলো। ডাঃনাগ বললেন, " হ্যাঁ বেহালার সুপার আপনার কথা বলেছেন। আপনিপিজি হাসপাতালে জয়েন করলেও একটা দিন বেহালা যাবেন টক্সিক নিউরোপ্যাথিকেসগুলোকে দেখার জন্য। আপনার পড়াশুনার ক্ষতি একটু হবে হয়তো,কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। ভেজাল তেল খাওয়া টক্সিক নিউরোপ্যাথিকেসগুলোকে বেহালার ক্যাম্পে গিয়ে দেখার জন্য কোন ডাক্তার রাজি হচ্ছেননা। আমি এ ব্যাপারে একটা নোট দিয়েছি। আশা করছি পরের সপ্তাহেই বেহালাথেকে আপনাকে উইথড্র করা হবে। তখন আপনি পি. জি জয়েনকরবেন।"

এই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে তীর্থ অস্বস্তিবোধ করে। সে কোন দয়া ভিক্ষা করেনি, বরং সে-ই দয়া দেখিয়েছে। বড়োচমৎকার কথা! আর কেউ রাজি হচ্ছেন না! মানে রাজি হওয়া বলে ব্যাপারএকটা আছে। তাকে যখন অসময়ে বিনা নোটিশে হঠাৎ আর জি কর থেকে বেহালায়পাঠানো হয়েছিলো, সে কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে সরকারি আদেশ পালন করেছিলো। এদিন তারও বলার ছিল যে ভারতবর্ষে প্রাপ্য সবচেয়ে উঁচুডিগ্রি এবং ডাক্তারি শাস্ত্রে সবচেয়ে কঠিন ডিগ্রির জন্য সে নির্বাচিত হয়েছে।পৃথিবীতে আর কোন সভ্য দেশ আছে কি যেখানে একজন সুপারস্পেশালিটি ছাত্রকেনিজ শিক্ষালয়ে থিতু হতে না দিয়ে বিড়ম্বিত করা হয়?

তবু নিজেকে সংযত করে সংলাপ আর না বাড়িয়ে সেনমস্কার জানিয়ে ফিরে এসেছিলো। এবং প্রতীক্ষা চলতেই থাকে। তারবহুদর্শী সিনিয়ররা বারবার একটা কথাই শিখিয়ে থাকেন,- প্রশাসকদেরবিশ্বাস করো না। তারা যা বলে, উল্টোটা ভাববে। বুরোক্রেসি একটা অর্ধভন্ডামি! কিন্তু ছোট থেকে তা তো শিখে আসেনি। শিখেছে মানুষকে বিশ্বাসকরতে। ডিসেম্বরের শেষে আবার গেলো রাইটার্সে। দেখা করলো জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করল তার আবেদনের হাল হকিকৎ।

"ওটা এখনো হয় নি ?" সেক্রেটারি যেন বিস্মিত হলেন, "আপনি একবার দেখুন তো কোথায় গেলো ফাইলটা।একটু পারস্যু কন।"

বিপন্ন তীর্থ জবাব দিয়েছিলো,"আপনি তো স্যার বলেছিলেন এর মধ্যেই অর্ডার বেরিয়েযাবে। এখন আবার ফাইলের পিছনে ছুটতে হবে?"

" ডাঃ সেন, অর্ডারটা বেরনোর দরকারআপনার । পিজির পোস্টিংটার দরকার আপনারই। ফাইলটা কতদূরমুভ করেছে দেখার গরজটাও আপনার।"

কথাটা এভাবে বলাটা তীর্থর অপ্রত্যাশিত ছিল না।অতএব তাকে নিপায় হয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারির কেরানিবাবুদের শরণাপন্ন হতেহোল। তাঁদের কাছ যথোপযুক্ত বিনয়ে জানালো তার সমস্যার কথা। তাঁরস্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি অপ্রকাশিত রাখলেন না। "জে-এস তো বলেই খালাস। আপনার সম্বন্ধেকী নোটদিয়েছেন আমরা কোথায় তার খোঁজ পাই বলুন তো! যাইহোক অপেক্ষাকন।"

ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর তীর্থকে একটা জিনিষ দিয়েছেনপ্রাণভরে। সেটা হোল বিদ্যাচর্চার সুযোগ। কিন্তু জীবনে উন্নতির আরসব বিভাগেই সে বঞ্চিত হয়েছে। তাই অপেক্ষা সে করতে শিখেছে।রাইটার্সের কাজের সপ্রতিভতায় সে আগেই অভ্যস্ত। তাই বাইরেরবেঞ্চে সে অপেক্ষা করতে লাগলো অন্তরের বিদ্রোহকে দমিয়ে রেখে।গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল অফিসারের দুপুর গড়িয়ে বিকাল হোল। চারটে নাগাদনিতান্ত অনিচ্ছায় আবার ঢুকলো দুই কেরানিবাবুর ঘরে। তাঁরাপ্রায় আঁতকে উঠলেন, " আপনি এখনো আছেন ? এখন তোযাবার সময় হয়ে এলো। আপনি বরং কাল আসুন, কাল খুঁজবো।"

ফাইল খোঁজাটা চিকিৎসা করার মতো জরি নয়। কালখুঁজলেও চলে। তীর্থ পরদিন এগারোটা নাগাদ রাইটার্সে এলো। দশটায় অফিস,সাড়ে দশটার আগে প্রবেশ ঘটে না, তাই এগারোটায় এলো। ওঁদের একজনসাড়ে এগারোটায় এলেন। চা- ও এলো তৎক্ষণাৎ।

" এসে গেছেন? দাঁড়ান চা-টা খেয়েই দেখছি।" ভদ্রলোক খাতা খুঁজতে খুঁজতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেলেন সে অভীষ্ট বস্তু। " এই তো, কদিন আগেই বেরিয়ে গেছে।ওটার নম্বর জে-এস ফিফ্‌টি ফোর।"

" কোথায় গেছে ?"

' আপনি ডি-এইচ্-এসের ঘরে দেখুন।"

ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেসর ঘরেরফাইলরক্ষক ব্যাপারটা শুনে কাগজপত্র দেখে বললেন, "আরে মশাই , ওরা ঐ রকমই করে। দায় এড়াতে যা খুশিবলে দেয়। আপনার ফাইলের কোন এন্ট্রি নাই এখানে।"

" কী করি বলুন তো?"

" আপনি একবার পার্সোনাল সেকশনেযান।"

পার্সোনাল সেকশন কোথায় জানে না, জানারপ্রয়োজন ও হয়নি কোন দিন। খোঁজ করে সেখানে গিয়ে জানতে পারলো যেডিলিং আজ নেই। কাল আসতে হবে। আঘাত পেতে পেতে মানুষ মরীয়া হয়।তীর্থও মরীয়া হোল। পরদিন আবার এলো পার্সোনাল সেক্শনে। সেখান জানা গেলোযে জে- এস্ ফিফ্‌টি ফোর্ এসেছিলো । ডেসপ্যাচে চলে গেছে।

"কী করি বলুন তো?"

“ আপনি বরং ‘হ’ বাবুর কাছে যান।সারি সারি ‘অ’ থেকে চন্দ্রবিন্দু বাবু বসে আছেন। ‘হ’ বাবুকোনজন খোঁজ করে তাঁর কাছে গেলো। ‘হ’ বাবু তখন চা আ মুড়িগল্প সহযোগে খাচ্ছেন। এই সময় উট্‌কো অনুরোধ এলে যে কোন লোকইবিরক্ত হবে। কর্ম্মব্যস্ত ম ানুষ তাই বিরক্তি অনুহ্য থাকলো না। “আরে, ওরকম কোন ফাইল এখানে নাই।”

“কী করি বলুন তো ?” তীর্থকাঁচুমাচু।

“ আপনি বরং একবার ‘য’ বাবুরকাছে যান,”- দয়াপরবশ উত্তর। এই ভাবে আরও দিন দুয়েক তাকেনিয়ে হযবরল বাবুদের মধ্যে পিং পং খেলা চললো। একজন পরামর্শ দিলেনমিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সমস্ত অর্ডার ওনার টেবিলহয়ে মিনিস্ট ারের টেবিলে যায়। তীর্থ গেলো একদিন। সুবেশ এবং সুদর্শন সি-এমশাই জানালেন তীর্থর নামে কোন ফাইল তাঁর কাছে নেই। চ ারদিন বিড়ম্বনাময়স্বাস্থ্যপরিক্রমার শেষে পার্সোনাল সেক্‌শন্‌ থেকেই খবর পাওয়া গেলোজে-এস ফিফ্‌টি ফোর্‌ গেছে ডিডিএইচ এস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে।তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিতে তিনি তীর্থকে প্রায় ধমকে উঠলেন,“ আপনার ফাইল আমার কাছে প াঠালো কেন? আপনি মাস্টারমানুষ। আমার কাছে কেন? আপনার সেকশনের ফাইল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনাদের সেকশনের এডি এইচ এসেরকাছে যান।”

“ তিনি কে ?”

“তাঁকে চেনেন না ? ডাঃ অজিত বটব্যাল। কী চাকরিকরছেন মশাই । তিনিই তো সর্বেসর্বা। আমরা ডি ডি এইচ এস হলে কী হবে,ফেতো পার্টি। ক্ষমতার কাছের লোক মশাই। যান, যান,-তিনি না চাইলেআপনার ঠাঁই নড়াটি হচ্ছে না”।

তাঁকে সত্যই চিনত না তীর্থ। পরে চরম চেনা চিনেফেলেছে। আবার খোঁজ নিয়ে রাইটার্সের টেবিল চেয়ার নির্মিত গলিঘুঁজিরমধ্য দিয়ে সেখানে গেলো। বাইরে দ্বার রক্ষকের কাছে জানা গেলো সাহেবভিতরেই আছেন। বাইরে থেকে কানে এলো ভিতরের আওয় াজ, “ দে, ওটাকে হিমালয়ের হাওয়া খাইয়ে আন”।

তীর্থ ঘরে ঢুকলো। এ-ডি এইচ এস বসে আছেন। তাঁকেঘিরে আরও কয়েকজন। বেশভূষা দেখে মনে হোল ডাক্তার। সকলের হাতেই কিছুকাগজপত্র, ফাইল ও কলম। তীর্থ বুঝলো ট্রান্সফার অর্ডারের জন্ম হচ্ছে।বে-আক্কেলে হয়ে বে-সময়ে ঢুকে পড়ায় সবাই বিরক্ত।

“ কী চান ? মধ্যমণি জিজ্ঞাসু।

“ আমি এ-ডি-এইচ এস ডাক্তার বটব্যালের সঙ্গেএকটু কথা বলবো।”

তীর্থ দাঁড়িয়ে।

“ আমিই ডাঃ বটব্যাল। এখন কথা বলার সময়নয়। ঢোকারই কথা নয়। যা বলার সংক্ষেপে বলুন। ” বক্তাকে দেখে বোঝা গেলো ত াঁর বয়স তীর্থর থেকেকমই। তীর্থ দাঁড়িয়ে থেকেই কথাবার্তা চালাতে লাগলো।

“ আমার নাম তীর্থ সেন। ডি-এমনিউরোলজিতে ঢুকেছি। সেই উপলক্ষ্যে পিজিতে পোস্টিং অর্ডারহয়েছে। এখন আর জি করে পো স্টিং; বেহালাতে ডেপুটশনে আছি। বেহালাছাড়ছেনা, ফলে আর-জি-করও ছাড়ছে না। আমার পড়াশুনো করার ভীষণ কষ্টহচ্ছে।”

“ আপনি ডি-এম করতে চান? আমাদের কাছেখবর আছে আপনি ডিএম করতে চান না। কই আগে তো আসেননি।”

অবাক কথা; তবুও বিনীত, “আগে আসতে হবে তা তো ভাবিনি। আমি জানি ডি-মপড়ার পোস্টিং অর্ডার হয়েছে পি-জিতে। এবং অ ামি সেখানে জয়েন করবো।আর ডি-এম করবো বলেই তো পরীক্ষা দিয়ে কোর্সে ঢুকেছি। করতে নাচাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।” জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিলো যে মহামহিমের খবরেরসোর্সটা কী!

“ বেহালাতে আপনাকে ডেপুটেশনেপাঠিয়েছে কারা?” প্রায় ধমকের সুর।

প্রশ্নের ধরণে তীর্থ বিরক্ত হোল। তবু উত্তরদিলো, “ রাইটার্স বিল্ডিংস্‌।”

“ এটা কোন কথা হোল ? আপনি কাল আসুনআপনার পোস্টিং অর্ডারের একটা জেরক্স কপি নিয়ে।”

তীর্থ দ্বিত্তি না করে বেরিয়ে এলো। আর বেশিকথাবললেই সে হয়তো উত্তেজিত হয়ে পড়তো। তার সমস্ত হৃদয় সীমাহীনতিক্ততায় ভরে গেলো। যেন ডি-এমকরতে চাওয়াতে অপরাধটা তারই। এবং আর জি কর যে ছাড়ছে না, সেঅপরাধটা ও যেন তারই।

আর জি কর হাসপাতাল থেকে বেহালা বিদ্যাসাগরহাসপাতালে ডেপুটেশন অর্ডারের একটা জেরক্স কপি নিয়ে পরের দিন আব াররাইটার্সে এলো। ডাঃ বটব্যাল ছিলেন না। সেদিন ছিলেন খোদ ডিডি এইচ এস বাডেপুটি ডিরেক্টর অফ্‌ হেল্‌থ্‌ সার্ভিসেস্‌। তিনি তীর্থর পরিচিত মুখ।এককালে মেডিক্যাল কলেজের রি-ইউনিয়ম উপলক্ষে একসঙ্গে থিয়েটারকরেছে। তাঁকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে তাঁর হাতেই জেরক্স কপিটাদিয়ে এলো। তিনিও অশ্বাস দিলেন যে ব্যাপারটা এবার হয়ে যাবে।

কয়েক দিন বাদে ওদিকটা গতিহীন দেখে পিজি থেকেএকবার ফোন করলো তীর্থ। ডি ডি এইচ এস ফোন ধরলেন, “আরে তুমি কী দিয়ে গেছো? ওটাতো আর-জি-কর থেকেতোমায় বেহালা পাঠাচ্ছে সেই অর্ডার। রাইটার্সের কোন ডিপার্টমেন্টতোমার ডেপুটেশন অর্ডার করেছিলে সেটাতো তোমার জেরক্স কপিতে নেই।তুমি রাইটার্সের মূল অর্ডারের জেরক্স কপিটা দিয়ে যাবে ক ালই। তা না হলেতোমার অর্ডার বেরোবে না।”

হা ঈশ্বর, একী বিপদে ফেললে তুমি! সেটা আছে তো?সুখের কথা সরকারি চাকরি করতে করতে তীর্থ অবাক হওয়া ব্যাপরাটাপরিত্যাগ করেছে বহুদিন। লবি ছাড়া, লাইন ছাড়া কোন সরকারি কাজই মসৃণগতিনয়। নিজের ডিপার্টমেন্টের কাছে একটু বিশ্বাসযোগ্যতা, একটুক্ষিপ্রতা আশা করার অধিকার তার নেই। কিন্তু তার কাছে সেটাআশা করা হবে প্রতি মূহুর্তে, প্রতি পদক্ষেপে! আমি শাসক,তুমি শাসিত। ছোটবেলায় স্কুলের একটা ছড়া মনে পড়ে গেলো-- 'বামুন গেলো কায়েত গেলো, তাঁতি হোলরাজা/খুরপি নিয়ে যুদ্ধ করে , আজকে বগল বাজা।'

মানসিক ভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্তহয়ে ঘরে এসেআবার খুঁজে বার করলো সে অভীষ্ট অর্ডারটি। এদিন এ-ডি-এইচ এস সাহেবছিলেন, এবং সঙ্গী পরিবেষ্টিত হয়েই। তীর্থ কোন মন্তব্য না করে জেরক্সকপিটি তাঁর হাতে দিলো।

" এই তো রাইটার্সের সেই কপিটা। এরআগে কী উল্টোপাল্টা কাগজ দিয়ে গেছেন! এটা ঠিক আছে।"

তীর্থ পিজিতে শুনে ফেলেছে এই গুণধরটি কথা। তাইতার কথার উত্তর দিলো না। শুধু ঘর থেকে বেরনোর আগে কর্তাদেরবশংবদটিকে আর একবার অনুরোধ করতে চাইলো, "ডাঃ বটব্যাল, আমি আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাইনা।আমি—"

"আমি তো আপনাকে বসতেও বলিনি।"

তীর্থর চোখমুখ অপমানে লাল হয়ে গেছিলো। এইলোকটার অভদ্রতার কথা শুনেই এসেছে, তাই বলে এতটা!

সে যথেষ্ট সংযত হয়ে অনুজপ্রতিমকে কেটেকেটে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করলো, "না ডক্টর, বসতে আমি আসিনি। সে আশা কোনদিন আমিকরিনি। সে প্রবৃত্তিও আমার নাই। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আমাকেঅহেতুক ভোগানো হচ্ছে । আমারটা প্রাপ্য, দোষটা আপানাদেরই।"

হাঁটতে হাঁটতে আর বি এম স্কুল এসে গেলো। রাণীবিনোদ মঞ্জরী স্কুল। এই অঞ্চলে মেয়েদের নামী হায়ার সেকেন্ডারী সরকারি স্কুল।এই মফঃস্বল শহরেও কোন সরকারি স্কুলে ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হওয়া রীতিমতকঠিন ব্যাপার। কোলকাতায় তো অসম্ভব প্রায়। কোলকাতায় ভর্তি মানে একেবারেনার্সারি ক্লাশে। উপরের ক্লাশে ভর্তি হয়-ই না। সরকারি কর্মচারিরাট্রান্সফার হলে ছেলেমেয়েদের কোন মনোমত স্কুলে ভর্তি করা একেবারেইঅনিশ্চিত। সেই ভয়ে ছেলেমেয়েকে আনতে পারেনি তীর্থ। অথচ এই স্কুলটা এখানে নামকরা স্কুল। সংলগ্ন হোস্টেলে আলো জ্বলছে। সেখানে আছে দেশগঠনেরকোরকেরা,--ভবিষ্যতের জননীরা! তীর্থ যেন মনে মনে প্রার্থনা করলো-' মায়েরা তোমার সুসন্তানের জন দি-ও। তাতেতোমাদেরও গর্ব, দেশের ও গর্ব। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তারাসুসভ্য হোক্, সুবিনয়ী হোক্।' তীর্থ জানে যে ভালো আর মন্দ নিয়েই সংসার। কিন্তুসেদিন একজন ডাক্তার আর একজন বয়স্কতর উচ্চতর ডিগ্রিধারী সমপেশাধারীরপ্রতি যে রূঢ় অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেছিলো, তার বোধহয় কোন তুলনাই হয় না। দাসপ্রথা কী এরথেকেও খারাপ ছিলো ?

সেই শেষ । সেদিনটা ছিলো মনে পড়ে বিরানববই সালেরপাঁচই ফেব্রুয়ারী । আর বছর খানেক বাদেই পরীক্ষা । পারস্যুকরা, স্তাবকতা করা, স্থান বিশেষে তৈলমর্দন করা, গড্ডালিকায় গাভাসানো, - কোনটাই সে কোনদিন করতে পারে নি; এখনও পারে না। একসাথেই চলতে লাগলো পি জি হাসপাতাল, বেহালা হাসপাতাল, আর-জি-করহাসপাতালের কাজ। পড়াশুনোর প্রয়োজনে কখনও বা অন্যান্য মেডিক্যালকলেজেও কাজ করতে হয়েছে। চললো অমানুষিক পরিশ্রম। পৃথিবীর ইতিহাসে এইবোধহয় প্রথম যে সর্বোচ্চ মেডিক্যাল ডিগ্রির প্রত্যাশী কোন ছাত্রকেএকাধিক হাসপাতালের কাজ বজায় রেখে লড়তে হয়েছে!

রাইটার্স সবুজ সংকেত দিলো না, তাই বেহালা হাসপাতাল ছাড়লো না; বেহালা না ছাড়লে আর-জি-কর ও ছাড়তে পারলো না ;আর-জি-কর না ছাড়লে পিজিও জয়েন করা হোল না। অথচ সে পিজিতে আউটডোরকরতো, ইনডোর দেখতো, এমার্জেন্সি ডিউটি করতো, সেমিনার করতো,আর-এম-ওর কাজ করতো। অপূর্ব সমাহার।

দিন চলে যায়। কালের নিয়মে পরীক্ষা ও হয়ে যায় ।তিরানববই সালের পনেরই মার্চ পরীক্ষা শেষ হোল।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও অতি সাধারণ। এ সব তোকতই ঘটে। মহাকালের ঘটনাবলিতে চমৎকারিত্ব তো থাকবেই। পরীক্ষারঠিক তিনদিন বাদে অর্থাৎ আঠারই মার্চ রাত্রি নটার সময় যখন সে তার ছেলে ওমেয়েকে তাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য তালিম দিচ্ছে, তখন একজন স্পেশালমেসেঞ্জার এসে তিনটি সরকারি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেলো। একটি হোল বেহালাহাসপাতাল থেকে রিলিজ অর্ডার, আর একটি হোল আর-জি-কর থেকে ট্রান্সফার অর্ডার, তিন নম্বরটি হোলআর-জি-কর থেকে রিজিজ অর্ডার। এতদিন মাথা খুঁড়ে ও প্রথম অর্ডারটিসে পায়নি! আজ হঠাৎ করে তিন তিন টি অর্ডার । কোন খবরনাই, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাই, কোন জানানোর প্রয়োজননাই। 'অপরাধী জানিল না কিবা তার অপরাধ, বিচার হইয়াগেল!' তখনও সে অফিসিয়ালি ছাত্র, কারণ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয় নি।

আদিকালের মানুষ যখন খোলস বিহীন ছিলো, তখন তারাছিলো অসভ্য। এখন মানুষ হয়েছে খোলসধারী সভ্য! তীর্থ মানবসভ্যতারঅগ্রগতির বহু নিদর্শন চাকুরিজীবনে আগেও দেখেছে, এবারেও দেখলো। সে শিখেছে যেপ্রশাসন হচ্ছে এক অনন্যপথ বিচরণকারী এক বৈভব, যাকে আয়াসে অর্জনকরতে হয়। এ এমনই এক বিভূতি যা ঠোকরাতে পারে, নিরাময় করতে পারে না; যা সমস্যার জনক

হতেপারে, সংহারক হতে পারে না।
ট্রান্সফার এবং রিলিজ অর্ডারের মধ্যে যতইঝটিকাসংকেত থাক, এল-পি-সি পাবার ব্যাপারে আবার সেই স্বাভাবিকগতিহীনতা ,সেই শাশ্বত ভ্রূকুঞ্চন, " দাঁড়ান মশাই, এতো তাড়াতাড়িএল-পি-সি পাওয়া যায়? গভর্নমেন্ট তো রিলিজ করেই খালাস। এল-পি-সি তৈরীকরতে সময় লাগবে না ? আপনি বরং জয়েন করে আসুন, এল পি সি পরে যাবেন"। তীর্থ শিখে গেছে যে এসব কথার জবাব দেওয়া বাতুলতা।এল পি সি নিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার যাতায়াতের খরচটা কে দেবে? সে বললোনা যে সে এর মধ্যেই নূতন চাকুরি স্থলে দেখা করে এসেছে এবং জেনে এসেছেএল পি সি ছাড়া সেখানে জয়েন করতে দেবে না।
হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়েছে। চারপাশে সুউচচশালগাছ। অথবা বলা যায় শালবনের মধ্যেই হাসপাতাল। ব্যাপারটা তাই-ই। এইঅঞ্চলটাই শালবন ছিলো। গাছ কেটে হাসপাতাল হয়েছে। কোয়ার্টার্স হয়েছে। এইভাবেই প্রকৃতির গর্ভজাত বনানী ধবংস করে মানুষ সেখানে ঢুকে পড়েছেতার সব জৈবিক চাহিদাগুলি নিয়ে। তীর্থ মনে মনেই আবৃত্তি করলো," সভ্যের বর্বর লোভ/ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জঅমানুষতা/ তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে/ বাষ্পাকুল অরণ্যপথে/পঙ্কিল হল ধূলি/ তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে-।"
শালগাছের পাতাবেয়ে , গা বেয়ে, ডাল বেয়ে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। গভীর স্তব্ধতারমাঝে শুক্লপক্ষের মূর্ছনা । ইতস্ততঃ কিছু ক্লান্ত গাভী শুয়েআছে। দু চারটি শূকর পথিপার্শ্বে নিদ্রামগ্ন। একটি কুকুর তাকে দেখেএকবার ভৌ নিনাদ তুলে আবার উদাসীন হোল। শুধু সারিবদ্ধ শালগাছগুলিআপনার বিরাটত্বের মহিমায় হাসপাতালের বিল্ডিং ছাড়িয়ে খেচর বিহীনআকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। ওই উচচতা থেকে যেন মানুষকে জানানদিচ্ছে তোমরা কেন এই উচচতা পাওনা ? তোমার কেন ভগ্ন কটি খর্বমননের দল ? আমরা তো দলবদ্ধভাবে একই সরলতায় একই উচচতায় বাস করি। তোমাদের মধ্যে এত ভেদ কেন? আমার অংশ দিয়ে তোমরা যদি দরজা জানালারকঠিন ফ্রেম তৈরী করতে পারো; তোমাদের হৃদয়ের ফ্রেমগুলিএতো পলকা কেন? এখানকার মাটি শুষ্ক, প্রকৃতি অকরুণ, তবু আমরানতমস্তক হইনি; সবকিছু প্রতিকূলতাকে জয় করেছি। তোমরাকেন পারো না ? দেখ, আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ না করে একই অভ্রংলিহ সম্মাননিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছি। তোমরা পরস্পরের প্রতিএতো বৈরী কেন? পরস্পরের প্রতি একটু সখ্যতা, একটু সান্নিধ্য, একটুউষ্ণতা-সেটা কি তোমাদের সাধ্যাতীত?
সাধ্যের অতীতনিশ্চয়ই! নইলে কেনই বা অজিত বটব্যাল সে দিন ওইরকমদুর্ব্যবহার করলো? না কী দুর্ব্যবহার করাটাই প্রশাসকদেরপ্রচলিত রীতি ? এক আধুনিক শিল্প সুষমা ? ভাঙো, চটিয়ে দাও এবংভাগাও! তাই যেদিন তীর্থ শুনলো তার এতো পরিশ্রমের ফলে যেছেলেটি জটিল রোগ থেকে ভালো হোল, তারই দাদা অজিত বটব্যাল; সেদিনতার মন চরম শূন্যতায় ভরে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো সেই মূহুর্তেই সেবিজিতকে কোলকাতায় ট্রান্সফার করে দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে শিউড়ে উঠেছিলো। কার পাপে সেকাকে শাস্তি দিতে চলেছে ? ওই ছেলেটি, ওই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা - তাঁরা তোকোন দোষে দোষী নয় তার কাছে।
বিজিত ছাড়া পেয়েছে দিন দশেক। দ্রকান্ত আজএসেছিলেন কল দিতে । সন্ধ্যার রাউন্ড সেরে তীর্থ গিয়েছিলো বিজিতকে দেখতে।অনেকটাই ভালো। চোখ মুখ অনেক উজ্জ্বল। আর কিছুদিন বাদেই কাজে জয়েনকরতে পারবে। ফেরার সময় বিজিত বললো, "ডাক্তারবাবু , আমার দাদা তো চিঠি দেবার সময়ইপায় না। আমার অসুখের কথা শুনে চিঠি দিয়েছে। আমার রোগেরডায়াগ্নোসিস্ শুনে খুবই অবাক হয়েছে। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে। আরবলেছে দাদা কীভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে বা কোন উপকারে লাগবে কী নাজানাতে। আপনাদের অনেক ব্যাপারেই না কী দাদার হাত আছে!" তীর্থ একথার কোন জবাব দেয় নি। তার চোখের সামনেবিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে গেলো ছেলে আর মেয়ের মলিন মুখ দুটি। তাদেরউৎসুক জিজ্ঞাসা বাবা কবে আবার তাদের সঙ্গেই থাকবে! মনে পড়লো স্ত্রীরকাতর অনুরোধ-"তোমাকে যদি একটু অ্যাডজাস্ট করতে হয়, করোনা!ছেলে মেয়ে দুটোও তো বাবাকে চায়। তাছাড়া তোমার ওই ডিগ্রিও তো ওখানেকোন কাজে লাগাতে পারবে না। আমি যে আর একা একা সব দিক সামলাতে পারছি না!" কানের কাছে রিণ্‌রিণ্ করে উঠলো অধুনাচালুআপ্তবাক্যটি --ইচ্ পোস্টিং ইন্ ক্যালকাটা ইজ্-আ পারচেজেব্‌ল্‌কমোডিটি; পলিটিক্যাল অর্ ক্যাশ।
বিজিত কিছুক্ষণ বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলো, "ডাক্তারবাবু দাদাকে তাহলে কী লিখবো।"
নিজের কর্কশ কণ্ঠটাকে যতটা স্তিমিত করা যায়সেই স্বরে তীর্থ জানালো "বিজিত, তোমার দাদা আমার ডি এম পড়ার সময় আমারঅনেক উপকার করেছেন। তুমি জানিয়ে দিও। আর কোন উপকারে আমার দরকারনেই।"
কোয়ার্টার্স্ এসে গেছে।
(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)